৪

জীবনধারণের অধিকার

এটিএম মোরশেদ আলম

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 'ক্রসফায়ার', 'এনকাউন্টার' ইত্যাদি নামে যে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালাচ্ছে, সে বিষয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে প্রতিবছরই কিছু মানুষকে প্রাণ হারাতে হচ্ছে, আবার বিচারের সম্মুখীন হওয়ার কোনো রকম সুযোগ ছাড়াই গণপিটুনিতে মারা যাচ্ছে আরো কিছু লোক, এই বিষয়গুলোও আলোচিত হয়েছে এখানে। এছাড়া রমনা বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা, ২১ আগস্ট ও ১৭ আগস্টের বোমা হামলা, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলাসহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতা যুদ্ধের ৩৭ বছর অতিক্রান্ত হলেও বিচার হয়নি যুদ্ধাপরাধী ও গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত অপরাধীদের, এই বিষয়টিকেও এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হয়েছে।

জীবনধারণের অধিকার হলো মানুষের 'সর্বোচ্চ অধিকার'।[১] সংবিধানের ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতার অধীনে রাষ্ট্র এই অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে বাধ্য।[২] আন্তর্জাতিক আইনের

---

১ জেনারেল কমেন্টস ৬(১৬), ইউএন জিএওআর, ডক. এ/৩৭/৪০, পৃ. ৯৩; ডক. সিসিপিআর/সি/২১/অ্যাড.১. অ্যাডপটেড বাই দি হিউম্যান রাইটস কমিটি ইন ৩৭৮ মিটিং (জুলাই ১৯৮২)।

২ বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে কনভেনশন এগেইনস্ট ইনহিউম্যান অর ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্ট (ক্যাট) এবং ২০০০ সালে ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) রেটিফাই করেছে।

বিধান অনুসারে কোনো অবস্থাতেই এই অধিকারকে প্রত্যাহার করা যায় না, এমনকি সামরিক শাসন বা জরুরি অবস্থাতেও না।[৩]

বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড : 'ক্রসফায়ার ও এনকাউন্টার'

২০০৪ সালে রাষ্ট্রের 'অভিজাত বাহিনী' র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) গঠিত হওয়ার পর বাংলাদেশে 'ক্রসফায়ার' শব্দটি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ব্যাপকহারে ব্যবহার হতে দেখা যায়। এরূপ প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের পরে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় একই গল্প বলা হয়ে থাকে। গল্পটি হলো– বিখ্যাত সন্ত্রাসী 'ক'কে গ্রেফতার করার পরে তার দেয়া তথ্য অনুসারে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে যাওয়া হয়। এই সময় উক্ত সন্ত্রাসীর সহযোগীরা আক্রমণ করলে 'ক' ক্রসফায়ারে নিহত হয়। উল্লেখ্য, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই অস্ত্র উদ্ধার করতে যাওয়া হয় ভোররাতে। ক্রসফায়ারের সময় অনেক গোলাগুলির শব্দ হওয়ার কথা থাকলেও এই শব্দ সাধারণত এলাবাসীরা শুনতে পায় না, কখনো কখনো শুনলেও যে কয়জন নিহত হয় সেই কয়টি গুলির শব্দ শোনা যায়। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যতই 'ক্রসফায়ার' বলা হোক না কেন, উদ্বেগের বিষয় হলো এগুলো আসলে রাষ্ট্রের পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিটের পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৮ সালে বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল ১৭৫ এবং ২০০৭ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৮০। লক্ষণীয় বিষয় যে, গ্রেফতার ছাড়া এরূপ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ২০০৭ সালে ছিল ৮১ এবং ২০০৮ সালে ১২৭, অর্থাৎ দ্বিগুণের কাছাকাছি।

সারণি ৪.১ : আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক হত্যা ২০০৮[৪]

বাহিনী / হত্যাকাণ্ডের ধরন	র‍্যাব	পুলিশ	র‍্যাব ও পুলিশ	সেনা ও যৌথ বাহিনী	বিডিআর	মোট
'ক্রসফায়ার' (গ্রেফতার ছাড়া)	৬৮	৪২	১১	-	৬	১২৭
'ক্রসফায়ার' (গ্রেফতারের পর)	১০	২০	১	-	-	৩১
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতার ছাড়া)	-	২	-	-	-	২
শারীরিক নির্যাতন (গ্রেফতারের পর)	-	৪	২	১	-	৭

৩ সংবিধানের ১৪১ক অনুচ্ছেদ।

৪ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

অসুস্থ	৪	২	-	-	-	৬
আত্মহত্যা (গ্রেফতারের পর)	-	২	-	-	-	২
মোট	**৮২**	**৭২**	**১৪**	**১**	**৬**	**১৭৫**

আসক ধারাবাহিকভাবে 'ক্রসফায়ার'-এর নামে এরূপ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে আসছে। এ বছরও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, *'ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার বা বন্দুকযুদ্ধ– যেভাবেই নামকরণ করা হোক, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পেছনের সরকারি ব্যাখ্যা নিয়ে জনসাধারণের প্রশ্ন ও সংশয় সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ নেই।'*[৫]

এ বছর সংঘটিত বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের দুটি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা হলো।

সাভারে ঘুমন্ত 'ডাকাত'কে ডেকে নিয়ে ক্রসফায়ার:[৬] ঢাকা জেলার সাভার থানায় ২২ এপ্রিল ২০০৮ র‌্যাবের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে মোঃ আলম (২৭ বছর, পিতা- মোঃ শহিদুল্লাহ, গ্রাম- ডুবাড়িয়া, সাভার, ঢাকা), বাদশা মিয়া ওরফে বাশার (২৯ বছর, পিতা- সুলতার মিয়া, গ্রাম- শিবপুর, সাভার, ঢাকা) এবং নুরুজ্জামান আনিস (বয়স ২৭, পিতা- মৃত কুতুব উদ্দিন, গ্রাম- বড়দেশী, সাভার, ঢাকা) নামের তিনজন নিহত হয়। আসকের অনুসন্ধান প্রতিবেদন নিশ্চিত করে যে, মানিকগঞ্জ জেলার উথলী থেকে ২২ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১টার দিকে র‌্যাব তাদের আটক করে সাভারের আমিনবাজার এলাকায় নিয়ে আসে। স্থানীয় লোকজন জানায়, ২২ এপ্রিল ভোররাতে আনুমানিক চারটার দিকে শ্যামলী পেট্রোল পাম্প (সাভার) থেকে চার-পাঁচটি গুলির শব্দ শোনা যায়। সকালে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে এসে তিনটি লাশ এবং র‌্যাবের গাড়ি দেখতে পায়। আসক অনুসন্ধানী দল সাভার থানা থেকে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, এই ঘটনায় র‌্যাব-৪ (মানিকগঞ্জ ক্যাম্প) দুটি মামলা (নং ৫৭ ও ৫৮, তারিখ- ২২/৪/০৮) দায়ের করেছে। এজাহারে মৃত তিনজনের নাম-পরিচয় দেয়া হলেও, তাদের গ্রেফতার/আটক করার বিষয়ে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এজাহারে উল্লেখ করা হয়, ২২ এপ্রিল রাত ১২.১৫ মিনিটে সন্ত্রাসীদের অস্ত্রসহ আটক করার উদ্দেশ্যে র‌্যাব সদস্যরা যাত্রা করে। রাত আনুমানিক সোয়া ৪টায় নিহত ব্যক্তিরা বড় ধরনের অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে সাভার ব্রিকফিল্ড এলাকায় প্রবেশ করে। তারা র‌্যাবের

---

৫ 'বন্দুকযুদ্ধে মৃত্যু এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্রের উদ্বেগ', আসক প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ৩০ জুলাই ২০০৮।

৬ আসক তদন্ত প্রতিবেদন, তারিখ ২৩ এপ্রিল ২০০৮; আরো দেখুন : *জনকণ্ঠ*, ২৩ এপ্রিল ২০০৮।

প্রতি গুলিবর্ষণ করলে, আত্মরক্ষার জন্য র‍্যাব সদস্যরা প্রথমে ১৪-১৫টি ফাঁকা গুলি করে। এজাহারে ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র-গুলি উদ্ধারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তিনটি মৃতদেহ উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, র‍্যাব সদস্যরা তাদের আটক করার কথা এজাহারে অস্বীকার করেছে। মামলাগুলো পুলিশ তদন্ত করেছে কিন্তু ফলাফল জানা যায়নি।

পুলিশ হেফাজতে ফকির চানের মৃত্যু :[৭] মোঃ ফকির চানকে (৩৫ বছর, পিতা- মোঃ মোতাহার, পেশায়- বাসচালক) নারায়ণগঞ্জ থানায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। ১৩ এপ্রিল ২০০৮ ফকির চানকে গ্রেফতার করার পর পুলিশ ফকির চানের স্ত্রী রাহেলাকে জানায়, ৬ এপ্রিল ২০০৮ সিদ্ধিরগঞ্জ থানা এলাকার সান্টু ফিলিং স্টেশনের ১০ লাখ টাকা ছিনতাই ঘটনায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার সোহেল রানা বাদি হয়ে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় একটি মামলা দায়ের করেন,[৮] কিন্তু সে এজাহারে ফকির চানের নাম উল্লেখ করেননি। সিদ্ধিরগঞ্জ থানার এসআই বাবুল আক্তারকে এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। স্ত্রী রাহেলা পরের দিন সকালে কিছু খাবার নিয়ে স্বামীর সাথে দেখা করতে গেলে নারায়ণগঞ্জ থানা পুলিশ তাকে সারাদিন বসিয়ে রাখে কিন্তু দেখা করার অনুমতি দেয় না। ১৫, ১৬ ও ১৭ এপ্রিল রাহেলা পুনরায় থানায় যায় কিন্তু তাকে দেখা করতে দেয়া হয় না। এ পর্যায়ে সে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গিয়ে লিখিত আবেদন জানায়, কোনো প্রকার প্রাপ্তি স্বীকার ছাড়াই পুলিশ সুপারের কার্যালয় রাহেলার আবেদনটি রেখে দেয়। ১৭ এপ্রিল রাহেলা জানতে পারে ফকির চানকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় পুলিশ রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। সেখানেও সে স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে ব্যর্থ হয়। ১৯ এপ্রিলের ভোররাতে দু'জন টেলিভিশন সাংবাদিক ফকির চানের বাড়িতে এলে তাদের কাছেই রাহেলা প্রথম জানতে পারে ফকির চান পুলিশ হেফাজতে মারা গেছে।

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) সরেজমিন তথ্যানুসন্ধান চালিয়ে জানতে পারে, ফকির চান মারা গেছে জেলা গোয়েন্দা কার্যালয়ে। ডিবি কার্যালয় জানায়– ফকির চানসহ আর চারজন আসামিকে সিদ্ধিরগঞ্জ থানা পুলিশ চারদিনের রিমান্ডে আনে। নারায়ণগঞ্জ পুলিশ সুপার একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ১৮ এপ্রিল মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই বাবুল আক্তার ডিবি কার্যালয়ে আসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। আনুমানিক রাত ১২টায় ফকির চান অসুস্থবোধ করায় তাকে হাসপাতালে নেয়া হয়, সেখানে সে মারা যায়। উক্ত

---

৭ আসক তদন্ত প্রতিবেদন, তারিখ ২২ এপ্রিল ২০০৮। আরো দেখুন : আবু আহমেদ মোঃ ফয়জুল কবির, 'পুলিশ রিমান্ডে মৃত্যু', আসক বুলেটিন, জুন ২০০৮, পৃ. ১৮।

৮ সিদ্ধিরগঞ্জ থানার মামলা নং-০৮, তারিখ ৬ এপ্রিল ২০০৮।

বিজ্ঞপ্তিতে ফকির চানকে ‘সন্ত্রাসী’ হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং সিদ্ধিরগঞ্জ সোনালী ব্যাংক গোদনাইল শাখার সামনে থেকে পেট্রোল পাম্প ব্যবসায়ী মোঃ সোহেল রানার কাছ থেকে গুলিবর্ষণ এবং ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দশ লাখ টাকা লুণ্ঠনের অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এই ঘটনায় সিদ্ধিরগঞ্জ থানায় ৬ এপ্রিল একটি মামলা দায়ের করা হয়, মামলা নং ০৮, ধারা- ৩৯৪ দণ্ডবিধি। পুলিশ দাবি করে যে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উক্ত এলাকার ফকির চানসহ আরো পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের পর তাদের কাছ থেকে লুণ্ঠিত টাকার মধ্যে এক লাখ চল্লিশ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে আসামি পুলিশের কাছে স্বীকার করে যে, সানারপাড়াস্থ জনৈক জসিমের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে। সেখান থেকে ১৮ এপ্রিল রাতে পুলিশ একটি ৩২-রিভলবার এবং দুই রাউন্ড গুলি উদ্ধার করে। এরপর হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় আসামি দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করে। পুলিশ তাকে পিছু ধাওয়া করলে কিছুদূর গিয়ে সে অন্ধকারে রাস্তায় পড়ে যায় এবং শরীরে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। অতঃপর অবশিষ্ট লুণ্ঠিত টাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য জেলা গোয়েন্দা শাখা অফিসে আনা হলে ফকির চান বুকে ব্যথা অনুভব করার কথা জানায়। সাথে সাথে তাকে নিকটস্থ খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক সেখানে ফকির চানকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এ ব্যাপারে একটি ইউডি মামলা দায়ের করা হয়।[৯]

হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক আসক টিমকে জানান– ফকির চানকে পুলিশ মৃত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে এসেছিল। তিন সদস্যবিশিষ্ট ময়নাতদন্ত দলের প্রধান ডা. নাজিম খান আসক টিমকে জানান– মৃতের দুই পায়ে এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট আনোয়ারুল ইসলাম সুরতহাল প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন– ‘নাকে ছোলা দাগ, দুই হাতের কবজিতে জখমের চিহ্ন, ডান হাতের কনুইতে সামান্য ছোলা দাগ, দুই পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে জখমের চিহ্ন এবং ছোলা দাগ। প্রস্রাবের রাস্তায় আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়।’

কারা হেফাজতে মৃত্যু

দেশের ছয়টি বিভাগে মোট ৭২ জন বন্দি কারাগারের মধ্যে মারা যায়। এর মধ্যে ৩১ জন বন্দিই মারা যায় ঢাকা বিভাগে (দেখুন কারাবন্দিদের অধিকার

---

৯ নারায়ণগঞ্জ থানার ইউডি মামলা নং ০৯, তারিখ ১৯ এপ্রিল ২০০৮।

অধ্যায়)।[১০] মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোনো তথ্যই কারা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়নি।

মৃত্যুদণ্ড

বাংলাদেশ নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ (ক্যাট) অনুস্বাক্ষর করেছে, যেখানে অমানবিক ও নিষ্ঠুর শাস্তি প্রদান থেকে রাষ্ট্রকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখনো দেশের প্রচলিত আইনের অধীনে এই শাস্তি প্রদানের বিধান আছে, যেমন– প্রচলিত আইনের অধীনে ধর্ষণ অথবা নারী ও শিশু পাচারের শাস্তি হলো মৃত্যুদণ্ড। ১১ জুন ২০০৮ রাষ্ট্রপতি সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ জারি করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকারী আইনের তালিকাকে আরো একটু লম্বা করেন। উপদেষ্টা পরিষদে অধ্যাদেশটি অনুমোদিত হওয়ার পর আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করে মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে সংগঠনের অবস্থান ব্যাখ্যা করে এবং এই আইন জনগণের মৌলিক ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করবে বলে সরকারকে আইনটি প্রণয়ন হতে বিরত থাকার অনুরোধ জানায় :

> '....এ ধরনের কঠোর আইন এবং তার কঠোর ব্যবহারের অভিজ্ঞতা, বিশেষত আমাদের মতো দুর্বল গণতান্ত্রিক কাঠামোর দেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক নয়। অনেকক্ষেত্রেই এ ধরনের আইনকে ব্যবহার করে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নজির আমাদের সামনে রয়েছে। আমরা মনে করি, বিশেষ আইনের চেয়ে প্রচলিত আইনের সঠিক প্রয়োগ এবং তাতে প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনী আনার মাধ্যমেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ প্রতিরোধ সম্ভব।'[১১]

২০০৮ সালের সন্ত্রাস দমন আইনে সন্ত্রাসের সংজ্ঞাকে বিপজ্জনকভাবে প্রশস্ত করা হয়েছে 'বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোনো অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো কাজ করতে বা করা হতে বিরত থাকতে বাধ্য করে' এমন যে কোনো কিছুই সন্ত্রাস হিসেবে বিবেচিত হবে।[১২] কোনো ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করলে বা কোনো ব্যক্তির কোনো সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করলে অথবা কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য বস্তু, আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোনো প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করলে বা নিজ দখলে রাখলে তা সন্ত্রাসী কার্য হিসেবে বিবেচিত

---

১০ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

১১ 'উপদেষ্টা পরিষদে সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮ অনুমোদন; আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর অভিমত', আসক প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ২০ মে ২০০৮।

১২ সন্ত্রাসবিরোধী অধ্যাদেশ ২০০৮, ধারা ৬(১)।

হবে।[১৩] এখানে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে তা অপব্যবহার করে এর আওতায় যে কোনো ব্যক্তিকেই শাস্তি দেয়া সম্ভব। ২০০৪ সালেও সন্ত্রাস দমনের নামে এরূপ একটি আইন প্রণীত হয়েছিল এবং আইনটিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বা ক্ষমতাহীনদের বিরুদ্ধে ব্যাপকভবে অপব্যবহৃত হতেও দেখা গেছে।

রাজনৈতিক সংঘাত

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত দেশে জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকায় এবং অক্টোবর পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকায়, এ বছর রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা প্রকাশের সুযোগ ছিল কম। তারপরও রাজনৈতিক সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে এবং কিছু মানুষ নিহত হয়েছে, কিছু মানুষ আহত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে সংঘর্ষে ৪৫ জন আহত হয় ও একজন মারা যায়, আওয়ামী লীগ ও শিবির সংঘর্ষে ২৫ জন এবং বিএনপি ও বিএনপি সংঘর্ষে ৫৫ জন আহত হয়।

সারণি ৪.২ : রাজনৈতিক সংঘাত ২০০৮ (অক্টোবর পর্যন্ত)[১৪]

রাজনৈতিক দল	ঘটনা	আহত	নিহত
আওয়ামী লীগ-বিএনপি	৩	৪৫	১
আওয়ামী লীগ-শিবির	২	২৫	
অভ্যন্তরীণ সংঘাত			
বিএনপি-বিএনপি	১	৫৫	১
মোট	**৬**	**১২৫**	**২**
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পুলিশের সংঘাত			
বিএনপি-পুলিশ	১	১০০	
সর্বমোট	**৭**	**২২৫**	**২**

ডাক্তারি অবহেলা

১৩ *প্রাগুক্ত*, ধারা ৬(১)(ক)ও (খ)।
১৪ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে সঠিক ও কার্যকর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক মূলনীতি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে,[১৫] কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডাক্তারি অবহেলার কারণে মৃত্যুর ঘটনা ধারাবাহিকভাবে ঘটে চলেছে। ২০০৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ডাক্তারি অবহেলাজনিত কারণে এরূপ মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৫২ জন।[১৬]

যুদ্ধাপরাধ/গণহত্যা

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সেক্টর কমান্ডারস ফোরামসহ বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে আন্দোলন ২০০৭-০৮ সালে বেশ জোরদার হয়। এই সময়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে বেশ কিছু মামলা দায়ের করা হয়। যেমন–

- মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোজাফফর আহমেদ ১৭ ডিসেম্বর ২০০৭ জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, দুই সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লা ও মোহাম্মদ কামারুজ্জামানসহ নয়জনের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আদালতের নির্দেশক্রমে ১ জানুয়ারি ২০০৮ ঢাকার কেরানীগঞ্জ থানায় নথিভুক্ত করা হয়।[১৭]
- জামায়াতে ইসলামীর আমির মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল কাদের মোল্লাসহ ৬০-৭০ জনকে আসামি করে অপর একটি মামলা দায়ের করেন একজন মুক্তিযোদ্ধা আমির হোসেন মোল্লা। ঢাকার সিএমএম আদালতে ২৪ জানুয়ারি মামলাটি দায়ের করা হয়।[১৮]

কিন্তু রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এসব চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে এ বছরও কোনো তদন্ত বা অন্য কোনো কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইনের বিধান অনুসারে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বা গণহত্যা সংক্রান্ত মামলা দায়ের করার এখতিয়ার একমাত্র সরকারের।

---

১৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। আবার, ১৮ অনুচ্ছেদে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১৬ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

১৭ 'অবশেষে নিজামী-মুজাহিদ গংয়ের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা গ্রহণ', *যুগান্তর,* ২ জানুয়ারি ২০০৮।

১৮ 'নিজামী-মুজাহিদদের নামে আরও একটি হত্যা মামলা' *সংবাদ,* ২৫ জানুয়ারি ২০০৮ ।

কিন্তু ১৯৭৪ সালের পর থেকে এ ব্যাপারে কোনো সরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

নির্বাচন কমিশন এ বছর অনুষ্ঠিত স্থানীয় সরকার এবং জাতীয় নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধীরা অংশ নিতে পারবে না বলে ঘোষণা দেয়। কিন্তু শর্ত হলো, এরূপ যুদ্ধাপরাধী আদালত কর্তৃক ঘোষিত হতে হবে। যেখানে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কোনো সরকারি উদ্যোগই এখন পর্যন্ত নেয়া হয়নি সেখানে এরূপ শর্ত পক্ষান্তরে যুদ্ধাপরাধীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার পথকেই সুগম করে।

বক্স ৪.১ : যুদ্ধাপরাধীর তালিকা
ওয়ার ক্রাইমস ফ্যাক্টস্ ফাইন্ডিং কমিটি ১,৫৯৭ জন যুদ্ধাপরাধীর একটি তালিকা প্রকাশ করে ৩ এপ্রিল ২০০৮।[১৯] নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে ১৩ জন গবেষক সারা বাংলাদেশে গবেষণা চালিয়ে এই তালিকা তৈরি করেন। তালিকায় জামায়াত নেতা গোলাম আজম, মতিউর রহমান নিজামী, আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ, দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, আব্বাস আলী খান, আব্দুল কাদের মোল্লা, বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, সাবেক বিএনপি জোট সরকারের প্রভাবশালী অনেক মন্ত্রী, এমপি এবং নেতার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।[২০]

সেক্টর কমান্ডারস ফোরামসহ অন্যান্য সংগঠন ও ব্যক্তিরা যখন যুদ্ধাপরাধী এবং গণহত্যার অপরাধীদের বিচারের দাবি জোরদার করে, তখন এই দাবিকে ভিন্নখাতে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামীর অনুসারীরা 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ' নামে একটি সংগঠন তৈরি করে ২৬ জানুয়ারি ২০০৮।[২১]

গণপিটুনি

১৯ '১৫৯৭ যুদ্ধাপরাধীর তালিকা' সমকাল, ৪ এপ্রিল ২০০৮; 'দেড় হাজার যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত', *সংবাদ*, ৪ এপ্রিল ২০০৮।

২০ ১৯ এপ্রিল ১৯৭৫ পর্যন্ত ৩৭,৪৭১ জনকে যুদ্ধাপরাধের দায়ে গ্রেফতার করা হয় এবং ৭৫২ জনকে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। আরো দেখুন : 'শুরু হয়েও যেভাবে থমকে গেল যুদ্ধাপরাধের বিচার', *সমকাল*, ২৭ জানুয়ারি ২০০৮।

২১ 'জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের দু'হাজার প্রতিনিধির ১৫৫০ জনই জামায়াতের রুকন', *সমকাল*, ১৩ জুলাই ২০০৮।

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার প্রতি অনাস্থার সবচেয়ে মারাত্মক প্রকাশ হলো গণধোলাই বা গণপিটুনি। পত্রিকায় প্রায়শই এরূপ ঘটনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়। ছিনতাইকারী ও ডাকাত সন্দেহে এ বছর এরূপ গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে নরসিংদী, চট্টগ্রাম, নাটোর, কচুয়া ও ডামুড্যায়।[২২] এখানে উল্লেখ্য, অনেক ক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও এরূপ গণপিটুনিতে জনগণের সাথে অংশ নিয়েছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভয়াবহ হলেও এটা সত্য যে, 'ক্রসফায়ার' বা 'গণপিটুনি' উভয়ই হলো বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং হত্যাকাণ্ড প্রতিরোধ করা হলো রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব।

সীমান্ত হত্যাকাণ্ড

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে প্রতিবছরই বেশ কিছু লোকের জীবনধারণের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে। এ বছর আসকের তথ্যমতে, বিএসএফের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে ৫১ জন, আহত হয়েছে ৪৯ জন এবং অপহৃত হয়েছে ১৯ জন।[২৩] সূত্রমতে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ হলো অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম।

সারণি ৪.৩ : সীমান্ত হত্যাকাণ্ড ২০০৮ (অক্টোবর পর্যন্ত)[২৪]

বিভাগ / নির্যাতনের ধরন	ঢাকা	খুলনা	রাজশাহী	সিলেট	মোট
গুলি করে হত্যা	-	২১	২৮	২	**৫১**
আহত	১	১৬	৩০	২	**৪৯**
অপহরণ	-	৩	১৪	২	**১৯**
শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা	-	১	১	-	**২**
মোট	**১**	**৪১**	**৭৩**	**৬**	**১২১**

ধারাবাহিক অব্যাহতি

২২ উদাহরণস্বরূপ, 'নরসিংদীতে গণপিটুনিতে দুই ডাকাত, ত্রিশালে দুই ছিনতাইকারী নিহত', *প্রথম আলো*, ৪ জানুয়ারি ২০০৮; 'চট্টগ্রামে গণপিটুনিতে তিন ছিনতাইকারী নিহত', *প্রথম আলো*, ১৩ মার্চ ২০০৮; 'কচুয়া ও ডামুড্যায় ৬ ডাকাত গণপিটুনিতে নিহত', *যুগান্তর*, ৪ এপ্রিল ২০০৮; 'গণপিটুনি ও বন্দুকযুদ্ধে ৯ ডাকাত নিহত', *ইনকিলাব*, ১৩ জুন ২০০৮; 'চট্টগ্রামে গণপিটুনিতে ছিনতাইকারী নিহত', *যুগান্তর*, ১১ আগস্ট ২০০৮।

২৩ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

২৪ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

চলেশ রিচিল

চলেশ রিচিলের ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে এ বছর কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ২০০৭ সালের মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর হেফাজতে মধুপুরের আদিবাসী নেতা চলেশ রিচিলের মৃত্যুর পর একটি তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু উক্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়নি। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) মনে করে, চলেশ রিচিলের মৃত্যুর কারণ উদ্ঘাটন এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণের জন্য এরূপ কমিশন গঠন ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ; কিন্তু 'তদন্ত কমিশনের প্রতিবেদন প্রকাশে বিলম্ব চলেশ রিচিল, তার পরিবার তথা আদিবাসী সম্প্রদায় এবং বাংলাদেশের সব নাগরিকের ন্যায়বিচার প্রাপ্তিতে একটা বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে।'[২৫]

রমনার গ্রেনেড হামলা

২০০১ সালের এপ্রিলে রমনা বটমূলে বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা মামলার শেষ পর্যন্ত কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে। এই হামলায় ঘটনাস্থলেই দশজনের প্রাণহানি ঘটে। ঘটনার পর ২০০১ সালেই ঢাকার রমনা থানায় দুটি মামলা দায়ের করা হয় এবং ২০০৩ সালের নভেম্বরে মামলার তদন্ত ভার সিআইডিকে অর্পণ করা হয়। আরো তিন বছর পর, ২০০৬ সালের ১০ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ইতোমধ্যে গ্রেফতার হওয়া হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নানকে এই মামলা দুটিতে গ্রেফতার দেখানোর জন্য আদালতে আবেদন করা হয়। মুফতি হান্নান অন্য মামলায় এর আগেই গ্রেফতার ছিল।

২১ আগস্টের বোমা হামলায় জড়িত থাকার দায়ে ১২ এপ্রিল ২০০৮ জঙ্গি আরিফ হাসানকে গ্রেফতার করা হলে রমনা বটমূল মামলার অনেক জট খুলে যায়।[২৬] আরিফ স্বীকার করে, চারজন প্রশিক্ষিত জঙ্গি ঐ বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। সে নিজে ছাড়াও অন্য তিনজন হলো– শরীয়তপুরের সুজন, নারায়ণগঞ্জের জুয়েল ও জনি।[২৭] আরিফের জবানবন্দি এবং ইতোপূর্বে প্রদত্ত মুফতি হান্নানের জবানবন্দিসহ অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে সিআইডি পুলিশ ১৬ জনকে আসামি করে একটি অভিযোগপত্র চূড়ান্ত করে। যাদের

---

২৫ 'আদিবাসী নেতা চলেশ রিচিলের মৃত্যুর ঘটনায় ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হোক', আসক প্রেস বিজ্ঞপ্তি, ১৭ মার্চ ২০০৮।

২৬ 'সাত বছর পর তদন্তে গতি, বোমা পোঁতায় জড়িত হাসান গ্রেফতার', *প্রথম আলো,* ১৪ এপ্রিল ২০০৮।

২৭ 'তিনটি টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় চার জঙ্গি : মারা যায় তাদের ১ জন', *সমকাল,* ৩ মে ২০০৮।

আসামি দেখানো হয়েছে তাদের মধ্যে আরিফ ও হান্নান ছাড়া আছে বিএনপি নেতা আব্দুস সালাম পিন্টুর ভাই তাজউদ্দিন এবং জঙ্গি নেতা আব্দুর রউফ।[২৮]

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট পল্টনে আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলায় ২৩ জন নিহত এবং শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। চার বছর পর ১১ জুন ২০০৮ এই মামলায় ২২ জনকে আসামি করে চার্জশিট দাখিল করেছে সিআইডি পুলিশ। চার্জশিটে সাবেক জোট সরকারের উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টু, তার ভাই তাজউদ্দিন ও হরকাতুল জিহাদ নেতা মুফতি হান্নানসহ অন্যান্য হরকাতুল জিহাদ সদস্যদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হামলার পরিকল্পনাকারী হিসেবে আব্দুস সালাম পিন্টু এবং বোমা সরবরাহকারী হিসেবে তার ভাই তাজউদ্দিনের নাম চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়।[২৯] এখানে উল্লেখ্য, ঘটনার পর বিচারপতি জয়নুল আবেদীনের সমন্বয়ে গঠিত হয় এক সদস্যের একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন। ২ অক্টোবর ২০০৪ এই কমিশন ১৬২ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন দাখিল করে। প্রতিবেদনে হমলার জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়ী করা হয়।[৩০] এখন এটা পরিষ্কার যে, এই প্রতিবেদন ছিল প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দেয়ারই একটি

---

২৮ ‘রমনা বটমূলে বোমা হামলা : মুফতি হান্নান তাজউদ্দিনসহ ১৬ জনের নামে চার্জশিট চূড়ান্ত’, *সংবাদ*, ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

২৯ ‘পিন্টু ও মুফতি হান্নানসহ ২২ জনকে আসামি করে চার্জশিট’, *যুগান্তর*, ১২ জুন ২০০৮।

৩০ ‘প্রতিবেশী দেশের গোয়েন্দা সংস্থাকে দায়ী করেছে বিচারপতি জয়নুল কমিশন’, *প্রথম আলো*, ২১ আগস্ট ২০০৮।

প্রয়াস।[৩১] ঢাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ চার্জশিটে উল্লিখিত আসামিদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে। মামলাটি বর্তমানে ঐ আদালতেই বিচারাধীন।[৩২]

১৭ আগস্ট গ্রেনেড হামলা

২০০৫ সালের আগস্টে সারাদেশের আদালতসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানে একযোগে বোমা হামলা চালানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা দেশে যেসব মামলা দায়ের করা হয়েছে, ২০০৮ সালে এগুলোর মধ্যে বেশকিছু মামলার অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে। তবে তদন্তে ব্যর্থতার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আসামিরা খালাস পেয়েছে। যেমন– বরিশালে ১৭ আগস্টের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মোট ১২টি মামলার মধ্যে আটটি মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে, এর মধ্যে সাতটি মামলাতেই সব আসামি খালাস পেয়েছে। শুধু একটি মামলায় একজন আসামির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়েছে।[৩৩] চট্টগ্রামে একটি মামলায় পুলিশের গাফিলতির কারণে তিন জঙ্গি খালাস পেয়েছে ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৮। মামলার রায়ে আদালতের পক্ষ থেকে দায়িত্ব অবহেলার জন্য মামলার বাদি এসআই এনায়েত উল্লাহ এবং তদন্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে।[৩৪] চট্টগ্রামের অপর একটি মামলায় ৩১ আগস্ট ২০০৮ ছয়জনের মধ্যে দু'জন আসামির দশ বছর করে কারাদণ্ড হয়েছে এবং চারজনকে খালাস দেয়া হয়েছে।[৩৫]

---

৩১ এই প্রতিবেদন দাখিলের পর বিভিন্ন সময়ে ২০ জন নির্দোষ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় এবং এদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য চালানো হয় পুলিশি নির্যাতন বলেও অভিযোগ ওঠে। সর্বাঙ্গে লাঠিপেটা করা, নখের তলায় সুচ ফুটানো, পায়ুপথে গরম সেদ্ধ ডিম ঢোকানো, ইলেকট্রিক শক দেয়া ইত্যদি সব নির্যাতনই চালানো হয় এদের ওপর। এদের মধ্যে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজি মোখলেছুর রহমানকে ৭ দিন, বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা শেষ করে চাকরির খোঁজে দেশে ফেরত শৈবাল সাহা পার্থকে ১৮ দিন, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা আখতারুজ্জামান আতাকে ১২ দিন, তুষার আহমেদ হাসানকে ১২ দিন, অলিউল্লাহকে ৬ দিন, জহির হোসেন লিটনকে ৫ দিন এবং আব্দুর রহিমকে ৮ দিন সিআইডি হেফাজতে রেখে নির্যাতন করা হয়। চার্জশিট থেকে এই ২০ জনের নামই বাদ দেয়া হয়। দেখুন, '২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনা ধামাচাপা দিতে বানোয়াট স্বীকারোক্তি আদায়ের চেষ্টা : সিআইডি টর্চার সেলে ৭ নির্যাতিতের কাহিনী', *ভোরের কাগজ*, ১৭ জুন ২০০৮।

৩২ 'একুশ আগস্ট গ্রেনেড হামলা, হুজি নেতা মুফতি হান্নানসহ ২২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন', *প্রথম আলো*, ৩০ অক্টোবর ২০০৮।

৩৩ '১৭ আগস্ট বোমা হামলা : বরিশালে আরেকটি মামলার রায়, সব আসামি খালাস', *প্রথম আলো*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৩৪ 'বোমা বিস্ফোরণ মামলা : চট্টগ্রামে পুলিশের গাফিলতির কারণে ৩ জঙ্গি খালাস; ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ', *ইত্তেফাক*, ১১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

৩৫ 'চট্টগ্রামে সিরিজ বোমা হামলায় ২ জঙ্গির ১০ বছর কারাদণ্ড', *যুগান্তর*, ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

রাজনৈতিক হত্যা মামলার বিচার বিলম্বিত

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলা

তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের বিচার এখনো শেষ হয়নি। এ বছরও এই মামলা বিচারক সঙ্কটের কারণে আপিল বিভাগে শুনানি করা সম্ভব হয়নি। ২০০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর এই মামলায় আসামিদের দায়ের করা লিভ টু আপিল গৃহীত হয়। কিন্তু বিচারক সঙ্কটের কারণে নিয়মিত আপিল শুনানি করা সম্ভব হচ্ছে না। মামলাটি শুনানি করতে আপিল বিভাগের কমপক্ষে তিনজন বিচারক প্রয়োজন, কিন্তু বর্তমানে আপিল বিভাগের বিচারকদের মধ্যে অনেকে পূর্বে এই মামলার শুনানির সাথে যুক্ত থাকায় তাঁরা এই মামলার শুনানি করতে পারছেন না। এখন প্রশ্ন হলো, মামলার শুনানির জন্য কেন নতুন বা বিশেষ নিয়োগ প্রদান করা হচ্ছে না?[৩৬]

জেলহত্যা মামলা

২৮ আগস্ট ২০০৮ হাইকোর্ট রায় প্রদান করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা খুনির সঙ্গীদের চিহ্নিত করতে পারেনি বিধায় শুধু পলাতক আসামি রিসালদার মোসলেমউদ্দিন ওরফে হিরণ খানের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন এবং আটক অপর চার আসামিকে খালাস দেন (চারজনের মধ্যে দু'জন কারাগারে আটক যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা খাটছে এবং অপর দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়েছিল)। অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি পেয়েছে পলাতক দুই আসামি দফাদার মারফত আলী শাহ এবং এলডি দফাদার মোঃ আবুল হাসেম মৃধা। সন্দেহের সুবিধায় আরো খালাস পেয়েছে লে. কর্নেল (বরখাস্ত) সৈয়দ ফারুক রহমান, কর্নেল (অব.) সৈয়দ শাহরিয়ার রশীদ, মেজর (অব.) বজলুল হুদা ও লে. কর্নেল (অব.) একেএম মহিউদ্দিন আহমেদ। কারাগারে বন্দি এই চার আসামিই নিম্ন আদালতের দেয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করেছিল। অন্যদিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পাওয়া পলাতক অন্য আট আসামি সম্পর্কে হাইকোর্ট কোনো মতামত না দেয়ায় তাদের দণ্ড বহাল আছে বলে কিছু আইনজীবী মত প্রকাশ করেন।[৩৭] রায় ঘোষণার পর নিহতের পরিবারের সদস্যসহ অনেকেই

৩৬ 'বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল শুনানি আটকে গেছে বিচারক সংকটে', *প্রথম আলো*, ১৫ আগস্ট ২০০৮।

৩৭ 'ওরা সবাই খালাস', *সমকাল*, ২৯ আগস্ট ২০০৮।

রায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং রায়ের সমালোচনা করে। মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল) মন্তব্য করেন, হত্যাকাণ্ডের ২২ বছর পর এই মামলা দায়ের করা হয়, এই সময়ে মামলার অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণ ও আলামত নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু হত্যাকাণ্ড যে হয়েছে এটা সবারই জানা এবং কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সেটাও সবার জানা।[৩৮] পরিবারের সদস্যরা মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে বলে জানা গেছে।

কিবরিয়া হত্যা মামলা

আওয়ামী লীগ নেতা এবং সাবেক মন্ত্রী শাহ এএসএম কিবরিয়া ২৭ জানুয়ারি ২০০৫ হবিগঞ্জের একটি জনসভায় বোমা হামলায় নিহত হন। তিন বছর পেরিয়ে গেলেও এই হত্যাকাণ্ডের বিচার হয়নি। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দেয়ার পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডের মূল হোতাদের রক্ষা করতে তড়িঘড়ি বিচারকাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছিল বলে বাদিপক্ষ অভিযোগ তুলেছে। মামলাটি বর্তমানে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন।[৩৯] কিবরিয়ার পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এই হত্যার তদন্ত দাবি করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে চাঞ্চল্যকর মামলা পর্যালোচনা সংক্রান্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সেল মামলাটি পুনরায় তদন্ত করার জন্য ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৮ নির্দেশ প্রদান করে।[৪০]

প্রফেসর তাহের হত্যা মামলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. এস তাহের আহমেদকে হত্যা করা হয় ২০০৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। রাজশাহীর দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ২২ মে ২০০৮ এই মামলায় একজন শিক্ষকসহ চারজনকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্তরা হলো– একই বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মিয়া মোঃ মহিউদ্দিন, অধ্যাপক তাহেরের বাসার কেয়ারটেকার জাহাঙ্গীর আলম, জাহাঙ্গীরের ভাই আব্দুস

---

৩৮ 'জাতি স্তম্ভিত হতবাক ক্ষুব্ধ', *জনকণ্ঠ*, ৩০ আগস্ট ২০০৮।

৩৯ 'শাহ এ এস এম কিবরিয়া হত্যার তিন বছর আজ, মামলার তদন্ত শেষ হয়নি এখনো', *প্রথম আলো*, ২৭ জানুয়ারি ২০০৮।

৪০ 'কিবরিয়া হত্যা মামলা আবার তদন্ত করবে সরকার', *নয়া দিগন্ত*, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

সালাম ও আত্মীয় নাজমুল হক। ট্রাইব্যুনাল অন্য দুই আসামি, শিবির নেতা সালেহী এবং জাহাঙ্গীরের পিতা আজিমুদ্দিনকে খালাস দেন।[৪১]

সাংবাদিক হত্যা মামলা

হুমায়ুন কবীর বালু

খুলনার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ সাংবাদিক হুমায়ুন কবীর বালু হত্যা মামলার সাত আসামিকেই খালাস প্রদান করেছেন।[৪২] দৈনিক জনযুদ্ধের সম্পাদক, খুলনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এবং মুক্তিযোদ্ধা হুমায়ুন কবীর বালুকে ২০০৪ সালের ২৭ জুন খুলনা সদর থানার হাজী ইসমাইল রোডে তার বাসার সামনে হত্যা করা হয়। পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) দশজনকে আসামি করে ২৫ এপ্রিল ২০০৫ আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে। আসামিপক্ষের আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল মামলাটি পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন। ১১ আগস্ট ২০০৭ খুলনা মেট্রোপলিটন ডিবি পুলিশ মামলার আসামি সংখ্যা ১১তে উন্নতি করে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করে। ১১ জনের মধ্যে চারজন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক ক্রসফায়ারে মারা যায়। নিহত আসামিরা হলো– সশস্ত্র জনযুদ্ধ সদস্য বিডিআর আলতাফ, সোয়েব, সুমন এবং শ্যামল।[৪৩]

মানিক সাহা

নিউএজ পত্রিকার খুলনা প্রতিনিধি, বিবিসি বাংলা সার্ভিসের প্রতিনিধি এবং খুলনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মানিক সাহাকে ২০০৪ সালের ১৫ জানুয়ারি বোমা মেরে হত্যা করা হয়। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন সময় তদন্ত শেষে খুলনা মেট্রোপলিটন ডিবি পুলিশের পরিদর্শক চিত্ত রঞ্জন পাল

---

৪১ 'ড. মহিউদ্দিনসহ ৪ জনের ফাঁসির আদেশ; শিবির নেতা সালেহীসহ ২ জন খালাস', *নয়া দিগন্ত*, ২৩ মে ২০০৮।

৪২ খালাসপ্রাপ্তরা হলো– পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির আব্দুর রশিদ মালিথা ওরফে দাদা তপন, নজরুল ইসলাম ওরফে খোঁড়া নজরুল, ইকবাল হোসেন স্বাধীন, নাজিমুদ্দিন, মাসুম, রিমন এবং জাহিদ।

৪৩ 'সব আসামি খালাস', *যুগান্তর*, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।

২০০৭ সালের ২ ডিসেম্বর সম্পূরক চার্জশিট দাখিল করেন।[৪৪] ১৬ জানুয়ারি ২০০৮ আদালত ১১ জন আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। মামলাটি বর্তমানে বিচারাধীন।[৪৫]

এসএম আলাউদ্দিন

মুক্তিযোদ্ধা, শিল্পপতি এবং দৈনিক পত্রদূত পত্রিকার সম্পাদক এস এম আলাউদ্দিনকে ১৯৯৬ সালের ১৯ জুন গুলি করে হত্যা করা হয়। আলাউদ্দিনের ভাই এস এম নাসিরউদ্দিন এই ঘটনায় সাতক্ষীরা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। খুলনা শহরের সুলতানপুর এলাকার বাসা থেকে পুলিশ যুবলীগ কর্মী সাইফুল ইসলামকে গ্রেফতার করে এবং তার বাসা থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত কাটা রাইফেল উদ্ধার করে। খুলনার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে সাইফুল স্বীকারোক্তি প্রদান করে হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা এবং এর সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নাম প্রকাশ করে। এরপর মামলাটি সিআইডিতে হস্তান্তর করা হয়, সিআইডি নয় ব্যক্তিকে আসামি করে অভিযোগপত্র দাখিল করে।[৪৬] এদের মধ্যে তিনজন (আব্দুস সাত্তার, খলিলুল্লাহ ঝাড়ু এবং আবুল কালাম) ২৬ জুলাই ১৯৯৯ আদালতে আত্মসমর্পণ করে। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাদের জেলহাজতে পাঠিয়ে দেন। পরে তারা হাইকোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পায়। এরপর তারা মামলাটি বাতিলের জন্য হাইকোর্টে আবেদন করে। হাইকোর্ট আপিল মঞ্জুর করেন। কিন্তু অ্যাটর্নি জেনারেলের আবেদনের ভিত্তিতে আপিল বিভাগ ২০০৫ সালের ১৬ মে হাইকোর্টের আদেশ খারিজ করে দেন। আজ পর্যন্ত মামলার বিচারকার্য শুরু হয়নি।[৪৭]

---

৪৪ অভিযোগপত্রে যাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয় তারা হলো– হাজি ইসলাম ওরফে কচি, সুমন ওরফে নুরুজ্জামান, আকতার হোসেন, আলী আকবর শাওন, বুলবুল, সাত্তার, শওকত হোসেন, ওমর ফারুক, মিথুল, বেল্লাল, সরোয়ার, মফিজ এবং বিডিআর আলতাফ।

৪৫ 'খুলনার সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা মামলার চার্জ গঠন : আবার বিচার শুরু', *সমকাল,* ১৭ জানুয়ারি ২০০৮।

৪৬ অভিযোগপত্রের আসামিরা হলো– আলীপুর গ্রামের আবদুস সাত্তার, খলিলুল্লাহ ঝাড়ু এবং তার দুই ভাই সাইফুল্লাহ কিসলু ও মমিন উল্লাহ মোহন, সুলতানপুরের ইস্কেনদার মির্জা ও আতিয়ার রহমান, শহরের কামালনগর এলাকার আবুল কালাম, নগরঘাটা ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ এবং তালা উপজেলার সাইফুর রহমান।

৪৭ 'এক যুগেও সাতক্ষীরার সাংবাদিক আলাউদ্দিন হত্যার বিচার শেষ হয়নি', *ইনকিলাব,* ২৩ জুন ২০০৮।